জীবনবিধান ও শিক্ষা– সবই মানুষের জন্য

এ লেখাতে কলম ধরতে গিয়েই হঠাৎ মনের কোণে উঁকী দিয়ে গেল একটা কথা। আসলে একটা কথা নয়– মনের সংশয়, দ্বিধা কিংবা ভয়– 'লেখাটা ধর্মীয় কোনো কলামের জন্য নির্বাচন করবে না-তো'? প্রায় প্রতিটা পত্রিকাতেই আমরা 'ধর্ম ও জীবন', 'ধর্ম', 'ইসলামী জীবন', 'ইসলাম ও জীবন' প্রভৃতি নামে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে জীবনের সাধারণ বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে চমৎকারভাবে কলাম সাজিয়েছি। যারা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ভাবেন, ধর্মীয় জীবনযাপন করেন; তারা সে কলাম বেশি বেশি পড়বেন ও মেনে চলবেন; এটাই স্বাভাবিক। মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে, 'সাধারণ কর্মজীবন ও ধর্মীয় জীবন আলাদা।' এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ধর্ম বলতে জীবন-বিচ্ছিন্ন আলাদা কিছু ভাবতে শিখেছি। জীবনকর্ম ও দৈনন্দিন চিন্তা-চেতনা থেকে জীবনবিধানকে (ধর্মকে) বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি– কখনো জেনেশুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে; কখনো মনের অজান্তে, না বুঝে। এভাবেই আমরা দৈনন্দিন জীবন-সাগর পাড়ি দিচ্ছি। হাসছি, খেলছি, কাঁদছি, সামনে এগোচ্ছি। কেউ কেউ আলাদাভাবে ধর্মবিধান পড়ছি; পরকালে কল্যাণের আশায় ধর্মীয় পোষাক পরে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করছি।

আমার এক বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার। কুয়েতে যেতে চায় চাকরি করতে। কুয়েতি এক ভদ্রলোক ইন্টারভিউ বোর্ডে বন্ধুর নাম জিজ্ঞেস করলেন। বন্ধু উত্তর দিলেন, 'আব্দুল বারী'। ভদ্রলোক এবার ভ্রু কুচকে আবার প্রশ্ন করলেন, ''এটা আবার কীভাবে সম্ভব? 'আব্দ-উল-বারী' অর্থাৎ 'সৃষ্টিকর্তার গোলাম'। 'আব্দ' (অর্থ 'দাস', 'বান্দা', 'গোলাম') দিব্যি আমার সামনে বসে, আর 'বারী' (মানে 'সৃষ্টিকর্তা') আছেন সাত আসমানের উপরে। এ সমীকরণ তো মেলে না! গোলাম থাকবেন সৃষ্টিকর্তার সাথে সাথে। এত দূরে গোলাম বসে থাকলে সৃষ্টিকর্তার সেবা হবে কীভাবে? এও কী সম্ভব?" সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির বিধান রেখেছেন আকীর্ণ করে জীবনের পথে পথে, চলায়-বলায়, জীবন-স্পন্দনে, কর্মে, চিন্তায়, জীবনযাপনে, অন্তরিক্ষে। আমরা কতিপয় ধর্মতান্ত্রিক তা পথ ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাই অন্য কোনো পথে, পরজনমে, নিস্তব্ধ কবরের সুনসান নীরবতায়। আবার কেউবা ভোগবাদী দর্শনের মোড়কে অনন্ত জীবনকে বাঁধতে চায় ভোগের অলীক পেলবতায়। জীবনবিধান (ব্যবস্থা, বিধি) ফেলেছি জীবন থেকে হারিয়ে। তাই বলছি, 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফুর্তি কর, আগামীকাল বাঁচবে কি-না বলতে পার? হেই, দুনিয়াটা মস্ত বড় ..।' এভাবে সৃষ্টিসেরা মানুষের সাথে চতুষ্পদের কোনো পার্থক্য রাখছিনে।

চিন্তার বিষয় তো বটেই। এ মহাদেশের ধর্মগুরুরা ধর্মের প্রতি বেশি আনুগত্য ও ভক্তি দেখাতে গিয়ে কোরআনে ব্যবহৃত 'দীন' শব্দের অর্থ করেছেন 'ধর্ম'। শিক্ষাকে বিভক্ত করেছেন 'দীনি শিক্ষা' ও 'নন-দীনি শিক্ষা' বলে। ফলে জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা বিচ্যুৎ হয়ে গেছে। আসলে নন-দীনি শিক্ষা বলতে কি কিছু আছে? কোরআনে ব্যবহৃত 'দীন' শব্দটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আরবি দীন শব্দের অর্থ বাংলায় ধর্ম বলা হয়। আসলে দীন শব্দের সঠিক সমার্থক শব্দ বাংলায় নেই। একইভাবে ইংরেজি রিলিজিয়ন শব্দটিও দীন শব্দের ব্যাপকতা ধারণ করতে পারে না। ধর্ম ও রিলিজিয়নের আরবি হলো মাজহাব, দীন নয়। আমাদের দীনের একটি অংশ হলো ইবাদত এবং নৈতিকতা। কিন্তু দীন বলতে আরও বিস্তৃত বিষয়কে বোঝায়। মানব জীবনের যত দিক ও বিভাগ আছে সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।' মানুষের জীবনযাপনে ও চিন্তা-চেতনার জন্য যত রকমের শিক্ষা- সবকিছুই দীনি শিক্ষার অন্তর্গত। ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীন (ধর্ম)–এর বিভাজন মুছে দিয়েছে। আমার এ আলোচনায় আমি দীনকে 'জীবনবিধান' (জীবনের জন্য যে বিধান) অর্থে ব্যবহার করছি। কোরআনের অনেক শব্দ না-বুঝে নিজের মনমতো করে আমরা শুধু ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করি; মনের মধ্যে আলাদা দ্যোতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি

করি। সাধারণ জীবন থেকে জীবনবিধানকে যোজন দূরে ঠেলে দিয়ে জীবনযাপন করি। এতে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা, কর্ম, চিন্তা-ভাবনা ব্যাহত হয়। তাই দিনে দিনে, কখনো ভোগবাদের সাহচর্যে, সাধারণ আটপৌরে জীবন থেকে জীবনবিধান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মানুষ এখন মানবিক বৈশিষ্ট্যবিহীন এক অভিশপ্ত ভোগবাদের নিছক ভাবলেশহীন যন্ত্র বনে গেছে। বোঝা যায় না, 'আমি কি মরে গেছি না-কি, মরে বেঁচে আছি।' এতেই বর্তমান সমাজ ও জীবনব্যবস্থায় যত বিপত্তি, অব্যবস্থা, দুর্গতি।

'কোরআন মানব জাতির জন্য পথনির্দেশিকা'। শুধু কোরআন ও হাদিস শিক্ষাকে দীনি শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষা) বলছি; আর দুনিয়ার বাকি সকল বিষয়ের শিক্ষাকে নন-দীনি শিক্ষা বলছি। কোনো কোনো শিক্ষাব্যবস্থাকে দীনি শিক্ষার নাম দিয়ে শুধু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের নিয়ম-নীতি (পরকালের জন্য আনুষ্ঠানিকতা) ও এ সম্পর্কীত মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। এ ধরনের বিভাজন নিতান্তই অমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কোরআন ছাড়া ইসলাম ধর্ম অচল। আবার শিক্ষা ছাড়া সৃষ্টিকে বোঝা, নির্দেশনা মোতাবেক জীবনযাপন করা, জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। কোরআনকে ঘিরেই জীবনবিধানের সকল ব্যাখ্যা। কোরআন বলে যে, 'এটি (কোরআন) মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দেশিকা ও উপদেশ্।' আমরা জানি, পথনির্দেশিকায় উল্লিখিত সকল বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে পথনির্দেশিকা বোঝা যায় না; সেমতো চলাও যায় না। সেজন্য কোরআনে উল্লিখিত একটা তুচ্ছ মশা থেকে অকল্পনীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত বিষয়কে ইহকাল ও পরকালের জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা নেওয়াটা ধর্মশিক্ষার আওতাধীন। এর স্বপক্ষে কোরআন ও হাদিস থেকে অসংখ্য আয়াত ও বর্ণনা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বলা হয়েছে, "অসীম করুণাময় (আল্লাহ)। তিনিই কোরআন শিখান। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। (আর) তিনি তাকে শিখান 'বয়ান'।"। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন কোরআন ও 'বয়ান' (জ্ঞানের আওতায় আসা বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা) শেখানোর জন্য। এখানে মানুষ সৃষ্টির আরেকটা উদ্দেশ্যকে (কোরআন শিক্ষা দেওয়া) বলা হয়েছে। 'কোরআন শেখানো' বলতে কোরআনে বর্ণিত শব্দগুলির শুধু উচ্চারণ করে পড়াকে বোঝানো হয়নি; কোরআনের আওতা অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগৎ, সকল কর্ম এবং প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত ও অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স) বিষয়ের জ্ঞানকে আহরণ করা, উপস্থাপন করা ও ব্যাখ্যা করাকে বোঝোনো হয়েছে। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে সামুদয়িক শিক্ষা চলে আসে। এ থেকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতা সম্বন্ধে পুরো ধারণা পেতে পারি এবং বুঝতে পারি, শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতাকে সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ করার কোনো যুক্তি নেই। আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ও জীবিকা অর্জনে কোরআন-হাদিসসহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান ভালো পথে কাজে লাগাতে হবে।

প্রতিটা দেশের আইন-কানুন থাকে; সেসব মেনে চলতে হয়। সেখানে জীবন ও চিন্তা-ভাবনা পরিচালনার কোনো বিধি-বিধান থাকে না। স্রষ্টার রাজত্বের বিধি-বিধান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভালোভাবে চলুক, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের স্বার্থকতা বিশ্ব-বিধাতা চান। সেজন্য তিনি বোধশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টির সেরা জীবের জন্য আইনকানুন (জীবনবিধান), চিন্তা-চেতনা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সৃষ্টির সেরা জীবের কাজ হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, নির্ধারিত আইনকানুন ও চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী চলা। নির্দেশিত পথ মোতাবেক কর্ম করা এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। সৃষ্টি টিকে থাকার জন্যও পারস্পরিক

নির্ভরশীলতা ও সৃষ্টির ভারসাম্য আছে। আছে স্বয়ংক্রিয় সৃষ্টি ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। একের প্রয়োজনে অন্যের সৃষ্টি। বলা যায়: জীব দিলো প্রাণ নিজ প্রয়োজনে, উদ্ভিদ দিলো সুধা প্রতিদানে; মিটলো জীবের ক্ষুধা অনায়াসে, সার্থক হলো সৃষ্টিকর্ম গূঢ়-তত্ত্ব রসে।

ধর্ম-দর্শন তা-ই বলে। আমরা কতিপয় না-বুঝ লোকের অপরিণামদর্শী কথায় ধর্মের আওতার মূল উপজীব্য ও উদ্দেশ্যকে গুটিয়ে শুধু পরকালের প্রতিদান প্রাপ্তির মধ্যে ধর্মকে (জীবনবিধান) সীমাবদ্ধ করি কী করে? ইহকালের উদ্দেশ্যভিত্তিক কর্ম-চিন্তা-চেতনা না থাকলে জীবনবিধান থাকে কী করে? পরকালই-বা থাকে কী করে? সৃষ্টি ও কর্ম আছে বলেই-না জীবনবিধান আছে। সৃষ্ট প্রকৃতি, জীবনাচার, ক্রিয়াকলাপ ও সৃষ্ট জগৎ নিয়ে শিক্ষা আছে। সৃষ্টি-কর্মকে জীবনবিধান থেকে পৃথক করা যায় না। যেমনি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ এডুকেশন) থেকে ধর্ম শিক্ষাকে আলাদা করা যায় না।

ইহবাদীরা ইহকালের কাজকর্মে ধর্মের ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে পুরো জীবনবিধানকে বিতাড়িত করে পরকালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ ধার্মীকেরাও ইহবাদীদের সাথে বাকবিতণ্ডায় না জড়িয়ে স্বেচ্ছায় অজ্ঞতাবশত জীবন ও জীবিকাকে উপেক্ষা করে জীবনবিধানকে ইহকালের আনুষ্ঠানিকতা ও পরকালে বেহেশত নসিবের সরু গলিতে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। তাই ইহকালের পুরো সৃষ্টিজগৎ ও কর্মজগৎ ইহবাদীদের জন্য ছেড়ে পরকালের চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এবং নিজেকে জিন্দা লাশের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। অথচ ইহকালের কর্ম ও চিন্তা-চেতনাই ধর্মের মূল ভিত্তি। ইহকাল আছে বলেই যে পরকাল আছে, সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন। ধর্মগুরুদের ইহজগৎকে না বুঝে, বিনা তর্কে ইহজাগতিক কর্মজগৎ ছেড়ে দেওয়াটা আদৌ উচিৎ হয়নি। কোরআনের উপরে-বলা আয়াত ছাড়াও সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, 'তোমরাই (মুসলিমগণ) শ্রেষ্ঠ উম্মত (সম্প্রদায়/জাতি), মানবজাতির কল্যাণ করার জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা ন্যায় কাজ (সত্য বলা, পরোপকার করা, ন্যায় বিচার করা, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি)-এর আদেশ করবে আর অন্যায় কাজ (মিথ্যা বলা, মানুষকে কষ্ট দেয়া, চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি) নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে; আর আহলে কিতাবিগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো; তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।' প্রশ্ন করা যায়, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ এ উম্মতের বিশ্বব্যাপী আজ এহেন নিঃশেষিতপ্রায় শোচনীয় দুর্দশা কেন? শ্রেষ্ঠ উম্মত নিজেদের কল্যাণই তো বোঝে না, তা মানবজাতির কল্যাণ করবে কী করে? আবার সুচিন্তা ও নির্দেশনা মোতাবেক কাজ ছাড়া মানবজাতির কল্যাণ আসে কী করে? এখানে কল্যাণ অর্থ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কাজের ও চিন্তার সমষ্টি। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' এখানে এক শ্রেণির ধর্মগুরু এই 'দাসত্ব, ইবাদত (লিইয়াবুদুন)' শব্দের ধর্মগ্রন্থের আলোকে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ব্যাখ্যা না দিয়ে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা দেওয়াতে এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলমান জাতি আজ অধঃপতন ও অন্ধকারের পথে পরিচালিত হচ্ছে। এদের একটা বিরাট অংশ দুনিয়া ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার মূল কাজ, পেশা, কাজের বাস্তব প্রায়োগিকতা ও দায়িত্বকে এড়িয়ে দুনিয়ার চিন্তা ও কর্মকে উপেক্ষিত ও অপ্রয়োজনীয় কর্ম বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। ইহজগতের সামগ্রীক শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত না করে শিক্ষাকে খণ্ডিত করেছে।

জীবন পরিচালনার জন্য যদি শিক্ষা হয়, তবে সে শিক্ষায় জীবনবিধান সন্নিবেশ করতে হবে। জীবনবিধান আমাদেরকে কী শেখায়? শেখায়– কীভাবে শিক্ষাটা নেবো; কীভাবে জীবন পরিচালনা করবো; কীভাবে জীবনযাপন করবো; কীভাবে সন্তান প্রতিপালন করবো; প্রতিবেশীর সাথে কেমন ব্যবহার করবো; কীভাবে আয়-উপার্জন করবো; মানবজাতির মধ্যে পাস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে; সমাজের অন্যদের প্রতি আমাদের দায়িত্বই-বা কেমন হবে; শকুনের মতো উপরে বসে মড়ির দিকে নীচে তাকাবো, না-কি উদারতার চর্চা করে মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে উর্ধ্বমুখী করবো– আমরা মানুষ হিসাবে কোনটাকে বেছে নেবো! ইত্যাদি। সবকিছুরই তো সুবিন্যস্ত বিধান আছে। আমাদের দেশগুরু ও ধর্মগুরুরা এসব নিয়ে ভালোমতো ভাবলে ও কর্ম করলে আমাদের জীনযাপন ও চিন্তাধারার উৎকর্ষ ও উৎকৃষ্টতা বাড়ে।

(১৩ নভেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।